শেষকথন

দেহের সঙ্গে আত্মার মিলনই জীবন–বিদেহ আত্মা মানেই নিথর দেহ। পাঠক, আপনি এখন সেখানটায় আছেন। বেঁচে থাকার যাবতীয় রসায়ন গতকাল রাত তিনটের পরে কোনও এক-সময়ে ঋতির জন্য শেষ হয়ে গেছিলো, দেড়-পৌনে দু'টো বছর কম যুদ্ধ করেনি সে। সিলিং ফ্যানের সঙ্গে একটা প্রাণহীনদেহ ঝুলছে। এজন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার রাতটিকেই বেছে নিয়েছে ঋতি–ঘটনার সময়ে শারদীয় শরদিন্দু আপনমনে অকৃপণ দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। মেঘমুক্ত মধ্যগগনে সেই তারাটিও নির্ঘুম জেগে ছিলো কাল সারারাত। কী অদ্ভুত! দরজার ছিটকিনিটাও দেয়া হয়নি–সেটা ইচ্ছে করেই, না অসচেতনভাবেই সে প্রশ্ন এখন নিতান্তই অবান্তর। বরং ঝুলন্ত মৃতদেহের নিচে ফুলস্কেপ কাগজের বড় লেখাটাই এখন সবার চোখে-মুখে।

যেখানে লেখা– দিদি ভাই, আমি যে আর সইতে পারিনে;

আর পাশেই সেই কালো রঙের ডায়েরিটা; রুমের এককোণে টেবিলে মৃদু আলো দিচ্ছে একটা টেবিল ল্যাম্প, তারই আবছা আঁধারি আলোয় গোটা রুমে অস্পষ্ট কিন্তু অনির্বাণ আলোর বিকিরণ ছিলো কাল রাতে–সে আলোতেই....। মেজেতে চেয়ারটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সবকিছু ঠিকঠাক করে চেয়ারটা পা দিয়েই খাট থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, সহজেই অনুমেয় তা। দু'টো বিছানাই পরিপাটি করে সাজানো। মনে হয় ধূপ জ্বালিয়েছিলো–এখনও একটু গন্ধ অনুভূত হয়।

হোস্টেল সুপার আবার মেডিসিনেরও প্রফেসর, তিনি বললেন–ওকে বেশ কিছুদিন ধরে কেনো জানি অস্থির মনে হচ্ছিলো আমার। হোস্টেলের সহকারী সুপার আবার ফরেনসিকের শিক্ষিকা, বললেন–আশ্চর্য! চোখ-মুখ-জিহ্বা অবিকলই আছে। মনেই হয় না হ্যাং।

তখন পূর্বদিকের দরজা দিয়ে ভোরের নিষ্ঠুর আলো এসে ঋতি মিত্রের দত্তের লাবণ্যমাখা মুখটাকে আরও উজ্জ্বল করছে যেন। ঋতির সমস্ত শরীরে সে ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে দিচ্ছে আজকের এই-বিষাদাকীর্ণ সকাল।

অতঃপর–নিবেদন, ইতি

পাঠক, মাফ করবেন–গল্পটি খুব দায়ে পড়ে লিখেছি, মানে লিখতে হয়েছে। ওই যে গোড়াতেই বলেছিলাম–ঋভু মিত্রের জন্য লিখতে হচ্ছে; তখনও বুঝিনি–কেবল ঋভুর জন্য নয়; ঋতি মিত্রের কথাও বলতে হবে এ-গল্পে।

দেবেন মিত্র-সুলেখা মিত্রর কী হলো–জানতে চাইবেন? সেদিকে এগুনোর সাহস কিংবা যোগ্যতা–কোনওটাই কী আর আছে এ-গল্প লেখকের?

মোহাম্মদ আবদুল মাননান
যুগ্মসচিব, ভুমি মন্ত্রণালয়
(উপদেষ্টা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। উপদেষ্টা সম্পাদক,
অরণি–ছয় মাসের সাহিত্যের কাগজ)
সেল–০১৭১৫০১৮৩৫৩
প্রকাশিত গ্রন্থ–কাব্য ৩টি, ছোটগল্প ৭টি, সম্পাদিত ১২টি।